# ইইউতে চলতি বছরে দেশে তৈরি পোশাক রপ্তানি বেড়েছে প্রায় ১৮%

সংগৃহীত ছবি

বাংলাদেশের তৈরি পোশাক শিল্পের সবচেয়ে বড় বাজার ইউরোপীয় ইউনিয়ন (ইইউ)। ২০২৪-২৫ অর্থবছরে বাংলাদেশের মোট তৈরি পোশাক রপ্তানির প্রায় ৫০ শতাংশই গেছে ইউরোপীয় ইউনিয়নের বাজারে। চলতি বছরের (২০২৫) প্রথম পাঁচ মাসে (জানুয়ারি-মে) ইইউতে বাংলাদেশের পোশাক রপ্তানি দাঁড়িয়েছে ৯৬৮ কোটি ডলারে, যা আগের বছরের একই সময়ের ৮২৩ কোটি ডলারের তুলনায় ১৭ দশমিক ৬১ শতাংশ বেশি।

তবে মাসওয়ারি হিসেবে মে মাসে রপ্তানি প্রবৃদ্ধি কমেছে বাংলাদেশের। ওই মাসে ইইউতে বাংলাদেশের পোশাক রপ্তানি হয়েছে ১৬১ কোটি ডলার, যা গত বছরের মে মাসের তুলনায় ৬ দশমিক ৪৬ শতাংশ কম।এটিকে একটি সতর্ক সংকেত বলে মনে করছেন বিশেষজ্ঞরা ; কারণ একই সময়ে প্রতিযোগী দেশগুলোর রপ্তানি বেড়েছে।

অন্যদিকে চীনের তৈরি পোশাক রপ্তানিতে বেশ ভালো রকমের প্রবৃদ্ধি দেখা গেছে । মে মাসে চীন ইইউতে ১৭১ কোটি ডলারের পোশাক রপ্তানি করেছে, যা গত বছরের একই সময়ের ১৪৫ কোটি ডলারের তুলনায় ১৭ দশমিক ৮৫ শতাংশ বেশি। সামগ্রিকভাবে ২০২৫ সালের প্রথম পাঁচ মাসে চীন ইইউতে মোট ১ হাজার ১০ কোটি ডলারের তৈরি পোশাক রপ্তানি করেছে, যেখানে প্রবৃদ্ধি হয়েছে ২০ দশমিক ৮৬ শতাংশ।

বিশ্লেষকদের মতে, যুক্তরাষ্ট্রে প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের চীনা পণ্যের ওপর পাল্টা শুল্ক আরোপের কারণে চীনের রপ্তানিকারক প্রতিষ্ঠানগুলো ইইউর বাজারে ঝুঁকছে। এতে ইউরোপে বাংলাদেশের জন্য প্রতিযোগিতা আরও কঠিন হয়ে উঠেছে। বাংলাদেশের পোশাক রপ্তানিকারকেরা বলছেন, যুক্তরাষ্ট্রের বাজারে পণ্যের ওপর আরোপিত শুল্ক কমানো না হলে সেখানে রপ্তানি কমার আশঙ্কা রয়েছে, একই সঙ্গে ইইউতেও চীনের সঙ্গে টিকে থাকতে হিমশিম খেতে হবে।

তুরস্ক, ভারত, কম্বোডিয়া, ভিয়েতনাম, পাকিস্তান, মরক্কো, শ্রীলঙ্কা ও ইন্দোনেশিয়া—এগুলো ইইউর অন্য বড় পোশাক রপ্তানিকারক দেশ। তবে এসব দেশের মধ্যেও অবস্থানগত পরিবর্তন লক্ষণীয়। চলতি বছরের প্রথম পাঁচ মাসে তুরস্ক ইইউতে ৩৮৭ কোটি ডলারের তৈরি পোশাক রপ্তানি করেছে, যা আগের বছরের একই সময়ের তুলনায় ৬ শতাংশ কম। অন্যদিকে, ভারত একই সময়ে ২৫১ কোটি ডলারের তৈরি পোশাক রপ্তানি করেছে, যেখানে প্রবৃদ্ধি হয়েছে ১৬ শতাংশ। শুধু মে মাসে ভারত ৫০ কোটি ডলারের পোশাক রপ্তানি করেছে, যা গত বছরের একই সময়ের তুলনায় ২ শতাংশ বেশি।

বাংলাদেশের পোশাক রপ্তানি খাতের সংশ্লিষ্টরা মনে করছেন, বাজারে প্রতিযোগিতায় টিকে থাকতে হলে পণ্যের বৈচিত্র্য বাড়ানো, উৎপাদন ব্যয় কমানো এবং নতুন বাজারের সন্ধান করাই হবে প্রধান কৌশল। অন্যথায়, বৈশ্বিক বাজারের চাপ সামাল দেওয়া কঠিন হয়ে পড়বে।